নির্বাসনের বিকল্প নেই

ব্যক্তিক জিনিসটা ব্যক্তির এক নিরুপদ্রব মেজাজ সৃষ্টি করে থাকে, এই রকম আমার মনে হয়। কিন্তু তা যে মাঝেমধ্যে দুর্লভ উপহার পেতেও সাহায্য করে সম্প্রতি সে কথা জানলাম। লেখকরা নিজেরা ছাড়া মনস্ক পাঠক যখন তাঁদের সাহিত্য পাঠ প্রায় বর্জন করেছেন সেই সময় (গবেট গল্পপ্রিয় বৌ-ফোদের ধরছি না) যোগসূত্রের তিনটি সংখ্যা সাহিত্যের দিকে আমাদের ফের নজর ফেরাতে প্ররোচিত করল। আহা ব্যক্তিকের কথাটা বলা হয়নি, লিটল ম্যাগাজিন তথা সাহিত্যের আঁতুড়ঘর সম্পর্কে আমি এখনো কিঞ্চিৎ আশাবাদী। নতুন পত্রিকা দেখলেই কিনি। ব্যাচেলার মানুষ, মাল টানা আর ম্যাগাজিন খাতে খরচ করি। বাধা দেবারও কেউ নেই।

তো আপনাদের প্রথম সংখ্যায় যে কটি টুকরো গদ্য ছাপা হয়েছে সেগুলিতে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টাটা উপেক্ষা করার মতো নয়। এবং এই খাতে যেসব চেষ্টা ফেষ্টা হয় সেগুলি সহনশীলভাবে দেখা কর্তব্য বলে মনে করি।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গল্প-উপন্যাস রচনা সে তো চলছেই। বস্তাপচা কতগুলো ধারণা সেক্ষেত্রে উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণের নির্ধারক। এই লেখাগুলি সেরকম নয়।

সাহিত্য ও জীবন-জীবন করে গলা ফাটানো এইসব লেখকের লক্ষ্য নয়। বলা আর দেখানোর মধ্যে এঁরা কিছু একটা খুঁজছেন, সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করছেন নিজ-নিজ ধরনে। জীবন আর সাহিত্য এঁদের রচনায় যেমন পৃথক নয় তেমনি রক্তাক্ষরে রচনার কথাটা চলে আসছে বিনা উচ্চারণে। কথা আর ব্যক্তির স্বর মিলে মিশে যাচ্ছে। অনুপস্থিতির দূরত্ব যেমন কমছে তেমনি ভান, তথাকথিত নিরপেক্ষতা ইত্যাদি খসে পড়ছে পালকের মতো।

কোনো একটা স্লোগান আপনাদের দরকার। পত্রিকার লেখকদের মতোই যদি সম্পাদকও নীরবে কাজ করতে চান তাহলে এই শোরগোলের মধ্যে কে আর তা লক্ষ করবে। সাহিত্যে হুজুগের আন্দোলনের কথা বলছি না, সঞ্জীবনের বার্তাটুকু অন্তত বলে দিতে হবে।

গদ্যচর্চার যে খাতে পত্রিকাকে আপনারা বইয়ে দিতে চান তার জন্য হয়ত 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' এই কথাটাও দরকার। অপরিণত পাঠক ও গোলা সাহিত্যকর্মীরা সেক্ষেত্রে পত্রিকাটি ভুল করেও হাতে তুলে নেবেন না। অন্যদিকে পরিণত পাঠকের চিন্তার সুবিধা হবে।

সাহিত্যের উৎসের দিকে ফিরে তাকানো, সাহিত্য নিংড়ে সাহিত্য রচনার যে ধারা—পত্রিকাটিতে তাই প্রশ্রয় পাবে বলে আশা করছি। সাহিত্যের ভূগোল বিজয়ে ঝাণ্ডা উঁড়িয়ে নেমে পড়বে না। বিবরণমূলক রচনার পরিবর্তে, দরিদ্র মানুষের যৌন জীবন চিত্রিত করার পরিবর্তে বাহ্য বাস্তবের আবর্জনা সরিয়ে তাকাবে গভীর এক বিপন্নতার দিকে। রচিত হবে লেখকের আত্মহননের আলেখ্য। তথ্য বহনকারী কুলিগিরির অসম্মানজনক কাজ থেকে নিষ্কৃতি পাবে ভাষা। ভাষার অন্দরমহল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তার বার্তার দিকটি শুধু চিত্তাকর্ষক হবে না, বাণী সেখানে বহু অর্থজ্ঞাপক। তার পটভূমি সুদূর বিস্তৃত। ঢেউ-এর পিছনে সমুদ্রের উপস্থিতি যেমন নিশ্চিত, বাস্তব, খণ্ড গদ্যগুলির পিছনে তেমনি অনুচ্চারিত থেকে যাবে এক ব্যাপ্তি। ক্যানভাস বড় করে, লক্ষ-কোটি চরিত্র এনে প্লটের ষড়যন্ত্রে বন্দী অসহায় মানুষের সাহিত্যের চরিত্র হয়ে ওঠার যে কৃত্রিমতার চর্চা এবার তা শেষ হোক।

গল্প কি গল্প নয়, উপন্যাস কি উপন্যাস নয়—এই প্রশ্নে তেমন আলোড়ন কোথায়। অর্থাৎ যাঁরা বলেন গল্পহীনতাই আধুনিকতা বা যাঁরা ফর্ম ভাঙার ব্রত নিয়েছেন বলেই ফর্ম ভাঙছেন। সমস্যাটা নিছক সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার নয়, আসলে সীমা কেন ? এটাই প্রশ্ন। শিল্প প্রসঙ্গে কত রকম স্বাধীনতার কথাই না আমরা শুনি। শেষ পর্যন্ত তা কোনো না কোনো রাজনীতির জোব্বার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

শিল্পীর স্বাধীনতাকে আমরা একটু বদলে নিতে পারি—শিল্পের স্বাধীনতায়। সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টায় আমরা যার পায়ে শেকল আটকে দিই।

লেখকদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—আপনাদের পত্রিকায় মাত্র তিনটি সংখ্যার মধ্যে এই লক্ষণাক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আশার কথা। সীমা ভাঙার কথা ঘোষণা না করেও সাহিত্য এই সব রচনায় প্রকৃতই ডানা মেলেছে। পরিকল্পনা বন্দী করেনি লেখার প্রাণ ও তার সম্ভাবনাকে। সংজ্ঞা বদলেছে, বদলাতে থাকবে। লেখকদের পিছু-পিছু এসে সমালোচকদের অগ্রণী অংশ তা জেনেও নেবেন। আবারও অঙ্কুরিত হবে নতুন রচনা, সংজ্ঞা তখন খোল নলচে বদলাবার কথা ভাববে আবারও। এবং কিছু লোক থাকবেনই যাঁরা এই অন্ধচক্রে ভ্রমণের পথ ত্যাগ করবেন। গল্প কি গল্প না, উপন্যাস কি উপন্যাস না—এই কথাটির কোনো আবেদন নেই তাঁদের কাছে। লেখকরা আপাতত সেই মুষ্টিমেয় পাঠকদের উপর নির্ভর করুন।

শিলালিপি ও গুহাচিত্র উঠে আসতে পারে একটি রচনায় তার নিহিত অর্থ-সহ। এখানে নিহিত অর্থ বলতে আমি বোঝাচ্ছি : ঠিক কারো উদ্দেশে রচিত নয়, ঠিক কোনো রচয়িতাও যেন নেই এই লিপি বা চিত্রের পিছনে। যেভাবে একটি পাতা খসে পড়ে, পালক উড়ে যায়—যদি সেভাবে একটি রচনা গড়ে ওঠে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

যখন বলা হয় অমুক 'ক' নিয়ে একটি গল্প বা উপন্যাস রচনা করছেন বা যখন জিজ্ঞেস

করা হয় 'আপনি কী নিয়ে লিখছেন ?' তখন যে খুব নিম্নস্তরের সাহিত্য সম্পর্কে কথা হচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'ক' সেই সাহিত্যের অবলম্বন। মানে সাহিত্য এখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। এবং ইচ্ছে করলেই এই সাহিত্যের ভিতর থেকে 'ক'-কে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব। আর তা করাও হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সেইসব আলোচনা সাহিত্যের আলোচনা বলেই গৃহীত হচ্ছে দেখি।

বিষয় ও আঙ্গিককে দু টুকরো করে নিয়ে সাহিত্য আলোচনার যে রীতি চলে আসছে সেই রীতি সম্পর্কেও আঙুল তুলতে হবে। যখন এই রীতির সমর্থকরা আবার নিজেরাই বলে থাকেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে এ জাতীয় কোনো বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। তাহলে তাঁরা তা ঘটান কী করে ? এ একটা স্ব-বিরোধ। পত্র-পত্রিকায় এরকম গর্ভস্রাব-জাতীয় সাহিত্য সমালোচনা ভুরি ভুরি হচ্ছে এবং তা করছেন স্বীকৃত পণ্ডিতরা।

পণ্ডিতরাই সব থেকে বড় মূর্খ। তাঁদের আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। এ কথাটা কে বলে দেবে ?

একটিও দুর্বল বাক্য লিখব না, দুনিয়ার সবাই যা জেনে বসে আছে সেই সব কথার চর্বিতচর্বণ করব না—ধরা যাক এ দুটি শর্ত প্রহরীর মতো বসে আছে। সেক্ষেত্রে কি লেখার আগে অনেকেরই হাত কেঁপে উঠবে না। একালের বাংলা গদ্য লেখকদের একজনের লেখা থেকে আর এক জনের লেখাকে পৃথক করা, চিহ্নিত করা এক কঠিন কাজ, প্রায় অসম্ভব। বাস্তবের বাইরের চেহারাটা প্রবঞ্চক সে কথা স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে তথাপি তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকদের রচনায় এই বাহ্যরূপের সাত কাহন ছাড়া আর কীই-বা আছে এবং হয়ত সেজন্যই লেখকের স্বাক্ষর থাকে না কোনো রচনাতেই। ছাপাখানার যন্ত্রই এখানে লেখক। বা নিম্নমানের কোনো সাংবাদিকই এইসব সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। যিনি সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে বেছে নিলে দায়িত্ব পালনে অপারগ হতেন। অসফল, ব্যর্থ সাংবাদিকরাই সাহিত্যের হাল ধরেছেন। কী করুণ অবস্থা !

দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, রাজনীতির চক্রে আবর্তন ও সাংবাদিকসুলভ সমাজ চিত্রণ—এই তিন লক্ষণাক্রান্ত না হলে সেট আর এখন বাংলা ভাষায় রচিত গদ্য বলে হয়ত গৃহীতই হবে না। লেখকের ঘাড়ের উপর একজন ভীতু সমাজ সংস্কারককে আমরা জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছি। আর লেখক মহাশয় কাগজ ঘেঁটে, দলিল দস্তাবেজ, মহাফেজখানা ঘেঁটে এক সুখপাঠ্য সমাজ ইতিহাস রচনার কাজে লেগে থেকে দিব্যি চোয়াল ভারী করে বসে আছেন। এবং এসবের মধ্যে পণ্ডিতিয়ানাও কম নেই ; এখান থেকে সেখান থেকে পণ্ডিতির ডাকটিকিট জুটিয়ে লেখার গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। তরুণ লেখকরাও এই ফর্মুলা পেয়ে বর্তে গেছেন। বিশেষ ভাবতে হচ্ছে না। সংবাদপত্রই এখন সাহিত্যের 'সোর্স মেটিরিয়াল।'

রাজনীতির সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের একটা গাঁটছড়া গড়ে উঠেছে। বিগত কয়েক দশকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মিশ্রণের এই প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েছে। লেখক যদি প্রাণ খুলে কথা বলেন তাহলে তিনি আক্রান্ত হবেন। আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকলে, বিনয়ের অবতার হলে তাঁকে ভণ্ড, কাপুরুষ বলা হবে। বাইরের এই চাপের মধ্যে পড়ে তাঁর পক্ষে নিরিবিলি বেছে নেওয়া, নিজেকে এই 'সমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভবের নামান্তর। যা ছিল স্বেচ্ছাশ্রম, সৃষ্টির কাজ এখন তা হয়ে উঠছে বাধ্যতামূলক কাজ। দাস শিবির থেকে উঠে আসছে ছন্দ, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং একঘেঁয়ে ন্যারেটিভ। প্যানপ্যানে সেন্টিমেন্টাল কাহিনী আর সস্তার গোয়েন্দা গল্পই এখন আমাদের সাহিত্য। সেকুলারইজম, মণ্ডল কমিশন, ক্ষেত মজুরের কাজের অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে স্থান পেয়েছে। সেখান থেকে সরাসরি চলে এসেছে সাহিত্যের পৃষ্ঠায়।

বেচারা লেখক! এই ফরমায়েশ তাঁকে মানতেই হবে। নতুবা বেছে নিতে হবে নির্বাসন। ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখলে ছোট কাগজ থেকে বড় কাগজ সবাই তাঁর লেখা চাইবেন। পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নামজাদা প্রকাশককে বলে দেবেন 'অমুকের লেখা ছাপুন!' 'পুরস্কার কমিটি' তাঁর নাম সুপারিশ করবে।

নির্বাসন। একমাত্র পথ। এটা অভিমানের কথা নয়। পালানোর নয়। একে আমি বলব শিল্পীর প্রতিবাদ। তাঁর আত্মরক্ষা। নিজস্ব ভূমি, স্বাধীনতা রক্ষার একক লড়াই।

'যোগসূত্র' সেই দ্বীপ হয়ে উঠুক। নির্বাসনে পুরস্কৃত লেখকরা নিজের-নিজের নামাঙ্কিত ঝাণ্ডা পুঁতে দিক এই দ্বীপে। এক মহান শিল্পোৎসবের সূচনা ঘটুক।

ফিরে যাই রাজনীতির কথায়, ক্ষমতার কথায়। ফাঁদগুলি চিনে নিতে হবে। ন্যালাক্ষ্যাপা লেখকের দিন শেষ হয়েছে। বিমূর্ত মুদ্রা শাসিত সমাজ তাঁকে গিলে ফেলবেই। শাসক-শ্রেণী কিছু টাকা গোনে না বসে-বসে, শুধু সংখ্যায় চোখ বোলায়। দরিদ্র মানুষের 'হা-অন্ন', তার খিদে, রাজনীতির বক্তৃতা ও নির্বাচনী ইসতেহারে, ক্ষমতার গোলক ধাঁধাঁয় হয়ে ওঠে এক চিহ্ন বিশেষ! ভালবাসা সেও এক চিহ্ন। এতখানি অপ্রত্যক্ষতা, দূরত্ব বাস্তবের এক নিষ্করুণ অপমান। ক্ষমতার এই শীর্ষ থেকেই দাস শিবিরের গদ্যকারের কাছে সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দেশ পাঠানো হয় : ব্যক্তি নয়, তার স্বপ্ন নয়, রাজনীতির জোশ্বার মধ্যে অনড়, অসহায়, জনগণ নামক এক বিপুল মাংসপিণ্ডের খিদে, যৌনতা ও বিকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবীচরণই কাম্য। বিবরণ, বিবৃতিতে ঠাসা পুনরুক্তির পুনরুক্তি করে যাও শুধু।

কালের বিচারে কোন লেখা টিকে থাকবে, কোনটাই-বা ধুয়ে মুছে যাবে নিশ্চিত করে কেউ সে কথা বলতে পারবে না। এখনকার লেখক কালকে কলা দেখান। বেশ করেন ধ্রুপদী সাহিত্য কাটা-ছেঁড়া করে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ তুলে আনেন লেখক সমালোচক। তারপর এক, দুই, তিন, চার এই ক্রমে এখনকার লেখার বিচারে বসেন। জ্ঞানপীঠ-সহ নামজাদা বহু পুরস্কারের ক্ষেত্রে 'এপিক'—গোত্রের রচনার প্রতি পক্ষপাতও

বোধহয় এই কারণেই। একটি গল্পকে টেনে বড় করা, সমাজ ইতিহাসের কোনো-না-কোনো পর্বকে আশ্রয় করে লেখা, বহু চরিত্র আমদানি, ঐতিহাসিক নথি ঘাঁটা, ডিটেলের মহামারী ঘোষণা ইত্যাদির ছক কাটা পথে প্রায় প্রতি বছর ঢাউস উপন্যাস উৎপাদিত হচ্ছে এ কারণেই। লেখা নয়, সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা নয়, পুরস্কার-দৌড়, জন-চিত্ত, সমালোচক-চিত্ত জয়ই লক্ষ্য। আমাদের সমাজে আড়াল ও পরোক্ষতাই সত্য বলে, অর্থ-যশ লিপ্সা চরিতার্থ করতে কলম বা তুলি ধরতে হচ্ছে এবং এ ধরনের থিয়েটারে যা হয়, তাই হচ্ছে, লেখককে মঞ্চে উঠতে হচ্ছে, তার মুখের উপর বালসে উঠছে আলো। মঞ্চ থেকে জলদগম্ভীর কণ্ঠে ওই লেখক ভাঁড়টি বলে চলেছেন 'জীবনের জন্যই শিল্প' গোছের গোদা-গোদা কথা।

যখন কিশোর পাঠকও জেনে ফেলেছে লেখকের 'তিন নম্বর চোখ' আছে, মাথায় রহস্যের গুদোম আছে—এর থেকে গুল আর কিছু হয় না, তখন শুধু ব্যবসার খাতিরে এই ধাপ্পাটিকে, প্রতিভার এক পুরাণ কাহিনীকে দেয়ালে আঁকতে ব্যস্ত রঙ কোম্পানির শিরোমণি মোটা এম. ডি.। আর তারই পাশে ছুকছুক করা কিছু ঠিকেদার লেখক ও কবি। এই যদি হয় শিল্পের জমি তো সেখানে কোনো সারমের অবধি পেচ্ছাপ করার জন্য তুলে দেবে না নিজের ঠ্যাং-টি। সে ন্যাজ তুলে পালাবে। আমার বিশ্বাস আর যাই হন লেখক নিশ্চয়ই কুকুরেতর নন। তিনি তো ভাবতে পারেন!

লেখা ছাপা, নিন্দে প্রশংসা, পিঠ চাপড়ানি সাফল্যের ক্ষেত্র দুর্ভাগ্যবশত প্রস্রাবপিপাসু ওই দেয়ালটিই, ওইটিই সাহিত্যের মঞ্চ।

নির্বাসন প্রয়োজন এই মঞ্চ থেকে, ওই অ্যাসিড আলোর বৃত্ত থেকে।

এও বাহ্য। নির্বাসনের মূল রহস্য রয়েছে শিল্পতত্ত্বের প্রশ্নে। সাহিত্য বিষয়ক প্রচলিত, জীর্ণ ধারণাগুলি আমাদের বিস্মৃত হতে হবে। নির্বাসন-তত্ত্বের এইটেই সব থেকে কঠিন পর্যায়। কী করে ভুলি সেই সব তোতাপাঠ। বিস্মরণের নতুন পাঠের জন্য প্রায় এক নতুন জন্ম প্রয়োজন।

শিথিলভাবে, বদভ্যাসে সাহিত্যে ভাষার যে ব্যবহার করে চলি, যেরকম তথাকথিত সাহিত্য-সাহিত্য ভাব আমদানি করি ভাষার সেই গর্ভে নতুনের সম্ভাবনা নিহতই হতে পারে কেবল।

কথা বলে দেখেছি আমি একা নয়, অনেকেই এভাবে ভাবেন, কণ্ঠ পান, খেদ প্রকাশ করেন দাস শিবিরের স্ফীত সাহিত্য কলেবর দেখে। আমি শুধু সব কটা কথা এক দমে বলে গেলাম এই আশায় যে এখানেই শেষ নয়, মরুতেই শেষ নয় সব।

শঙ্কর ভট্টাচার্য
৩/ডি, ড. জগবন্ধু লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১২

আন্দোলন আন্দোলন খেলা নয়

এরকম একটা কাগজের দরকার ছিল সত্যিই, সত্যিই দরকার ছিল এমন একটা পত্রিকার, যেখানে দশকের কথা নিয়ে ঢাক বাজানো হবে না বা ফাঁকা আন্দোলন-আন্দোলন খেলা চালানো হবে না। এসবের বদলে এখন বোধহয় দরকার সামনে-পেছনে তাকিয়ে পরিস্থিতিটাকে একটু বুঝে নেওয়ার, 'যোগসূত্র' সেটুকুই করতে পারে। যেমন তা সে করেওছে দ্বিতীয় সংখ্যায় চিত্তপ্রসাদের উপর ক্রোড়পত্রটিতে বিশেষ করে, এটাই সে করুক। করুক, কারণ সত্যিই এটার দরকার আছে। আমরা চিত্তপ্রসাদ বা এ ধরনের ব্যক্তিত্বকে ভুলে যেতে বসেছি, ভুলে যেতে বসেছি বারীন সাহার মতো মানুষকেও যিনি প্রখর বিশ্লেষণে সরব হতে পারেন, 'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব', ১ এবং ২-এর মতো রচনায়। সঠিকভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, 'হিউম্যান কনটেন্টটে ধরলে আমি বলব 'পথের পাঁচালি' ইজ এ ভোঁর গুড ফিল্ম। কিন্তু ইনডিয়ান কনটেক্সটে ধরলে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ পেলে মনে হয় এ প্রাইজ ফিল্ম-এর জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য। আর ভারতবর্ষ তো ওই দেখানো হয়েছে!' (টুকরো কথা, যোগসূত্র ৩, পৃ ৮৭) আসলে সম্পাদকমশাই, আমাদের জাতটাই যেখানে একটা তাঁবেদারের জাত হয়ে গেছে, ভিখিরির জাত হয়ে গেছে, যেখানে ঠিক হোক ভুল হোক একটা প্রশ্ন তোলার মতো মানুষ পর্যন্ত নেই সেখানে ঐ ধরনের ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব ব্ল্যাক আউট করাটাই জরুরি জানি, তবু রাজা যে ন্যাংটো এটা বলার মতো একটাও লোক থাকবে না মানতে, একটু কেন, বেশ অনেকটাই গায়ে লাগে। 'যোগসূত্র' প্রমাণ করল আরো কারো-কারো লাগে। এটাই বা কম কী? দেশময় আগাছার মতো হয় কাল্পনিক-গ্রামের তৈরি-করা ভাষায় লেখা গল্প-উপন্যাস নয়তো শহুরে মানুষের কোনো সমস্যারই মূলে না পৌঁছতে পারার অসহায়তা থেকে লেখা গল্প-গাঁজার বিপরীতে এ কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যায় বেরুনো অরুপরতন বসুর 'প্রতারক' এবং তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্মোহন'-এর উজ্জ্বলতাটুকু? অরুপরতন বসুর গল্পের ভূমি, মনে পড়ছে, এক রাত্রে যখন আমি গল্পটি একটানা পড়েছিলাম কোনো চায়ের দোকানে হট্টগোলের মাঝখানে বসে আমাকে কতটা আক্রান্ত করেছিল তার সাক্ষী রয়েছেন আমার এক পূর্বজ, যাঁকে প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম এ গল্প আমাকে এতটাই আহত করেছে যতটা হলে বলা যায় 'অমানবিক'। মনে আছে আমার বন্ধু দস্তয়েভস্কির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন এবং আমিও খুঁজে পাই নি আপত্তির কারণ। পাশাপাশি রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি এ সংখ্যায়! 'সম্মোহনের' প্রতিটি বাঁক, তাঁর

ভাষার প্রত্যেকটি অভিঘাত, মোচড়, অনুভূতি, উত্তাপ আমাকে লেখাটির কাছে বারবার ফিরিয়ে এনেছে। 'অংশগ্রহণ' নামে ওঁর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থটির পর এ লেখা প্রমাণ করে উনি আরো-আরো-আরো পরিণত হয়েছেন এবং আক্রমণোদ্যত, যার প্রকোপ থেকে বাঁচা কঠিন। অনেকদিন বাদে ওই দুটি গল্প পাওয়া গেল যা, বলতে কী 'যোগসূত্র' আগামী সংখ্যার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েই দিয়েছে। আমি আশা করতে চাই চতুর্থ সংখ্যা 'যোগসূত্রে' আরো একটি অন্তত এ ধরনের গল্প থাকবে, এবং কোন ক্রোড়পত্র বা প্রবন্ধ, যা পাঠককে ভাবাবে, বিরক্ত করবে, রাগিয়ে দেবে কেবল নিস্তেজ করে ফেলবে না। না প্রিয় সম্পাদক, আমরা চাইছি না 'এমন গপ্‌পো, এমন লেখা বেশ ফিরে ফিরে পড়া যাবে, চেটে চেটে পড়া যাবে, হইহই করে পড়া যাবে, যে কোনও পৃষ্ঠা যে কোন লাইন থেকে পড়া যাবে (সম্মোহন, যোগসূত্র / ৩, পৃ ১২৭)। চাইছি না, বরং চাইছি আরো এ ধরনেরই লেখা, এরকম, যা হই-হই করে পড়া যায় না। অবশ্য তাতে আপনাদের কাগজের খরচ চালানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে কেননা আমরা এখন আর চিন্তা করতে ভালবাসি না। যে লেখা ভাবায় এসময় তার চাহিদা না থাকাই স্বাভাবিক। তবু আপনাদের যুদ্ধ তো ওই রুচিবোধেরই সঙ্গে, ভয় কী ?

'যোগসূত্রের' জন্যে শুভেচ্ছা। কাগজ আরো সমৃদ্ধ হোক। ছড়িয়ে পড়ুক। শ্রদ্ধা।

পার্থ মুখোপাধ্যায়
৬৪, শ্যামবাজার স্ট্রিট কলকাতা-৪

মতামতের দায়িত্ব নিচ্ছি : বারীন সাহা

'যোগসূত্র'-এর তৃতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯২) আমার নামে কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। লেখাগুলি যথাক্রমে : (১) চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব— ১, (২) চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২, (৩) টুকরো কথা।

'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—১' লেখাটি আমার নয়। এর ভাষাও আমার নয়। এই লেখাটি কয়েক দিনের যৌথ আলোচনার ফল। ওই লেখাটির ভাষা শ্রদ্ধেয় ৺বিনয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের। সেই সময় 'দর্শক' পত্রিকায় কোনও লেখাই কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে ছাপা হত না। 'চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব— ১' নিবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমি গ্রহণ করতে পারি। যাই হোক, আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানা দরকার যে, এটি আমার লেখা নয়।

কার ভুলে লেখাটি ছাপা হয়েছে সে আলোচনা বর্তমানে অবান্তর।

বারীন সাহা
গড়পার, কলকাতা

মুদ্রণেরও বিষয়গত ভূমিকা থাকে

আপনাদের পত্রিকাটি আগ্রহভরেই সংগ্রহ করেছিলাম। অনেকগুলো ভাল রচনার সংকলন 'যোগসূত্র'-কে সাধুবাদ জানাতে হয়। মনে হয়েছে আপনাদের লক্ষ্য যেন গোড়ার দিকে —ভাল লাগার কারণটা মোটের ওপর এই-ই। হিতেশ সান্যালের রচনাটির সম্পাদিত রূপ প্রকাশের মধ্যে সে দায়িত্ববোধেরই ইঙ্গিত পাই। যে অজস্র রচনা জরুরি হলেও আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে তার কিছু কিছু সম্পাদিত হয়ে 'যোগসূত্রে' প্রকাশ পাবে— আশা করছি। প্রতিমা বড়ুয়ার লোককথা সরল অথচ মূল্যবান লেখা। আপনারা ছাপা নিয়ে ভাবতে চেয়েছেন— প্রুফ পড়েছেন যত্ন করে হরফ নির্বাচন এবং অঙ্গসজ্জায় রুচির পরিচয় আছে ; ছোট মেজারে লোককথার চেয়ে রিটিশপূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা কম্পোজ করালে বেশি ভাল হত। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের ক্ষোভ যথার্থ — তিনি তাকে ক্লমে পটুয়ার সময় থেকে পুরাণকথার কালের আলোচনায় পৌঁছে দিয়েছেন। পটুয়াদের নিয়ে, কারুশিল্পীদের নিয়ে, আদিবাসী সমাজকে নিয়ে ধোপদুরস্ত আনুষ্ঠানিকতার ধাষ্টামো পৃথিবী জুড়েই চলছে— এ হেন বিলাসিতার নৈতিক অধিকার কারোই থাকতে পারে না। বাস্তারের দিনলিপি আমাদের উন্মূল জীবনে সত্যলগ্নতার স্বাদ আনে। বারীন সাহা 'শনিবার' বলে একটি ছোট ছবিও করেছিলেন। তাঁর 'নন্দনতত্ত্ব – ২'-এর মাথায় আপনি লিখেছেন, '১৯৬৩ সালে 'দর্শক' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে…', 'ওই লেখাটি…' হওয়া দরকার ছিল। দেবীপ্রসাদের রচনাটি বিশেষ কাজের।

একটু অন্য কথা বলি। প্যারাগ্রাফিং কারো কারো মতো [বারোমাস] আপনারাও ইনডেন্ট করে করেননি—আবার দু-অনুচ্ছেদের মধ্যে লেডিংও এক রেখেছেন। মুদ্রণেরও বিষয়গত কিছু ভূমিকা থাকে…এসব না করলে সেটুকু ব্যাহত হয়। অপরাহ্ণ (পৃ ১৭), আভ্যন্তরিক (পৃ ১৯), উনিশ (পৃ ২৪—কিন্তু ঊনবিংশ), সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি (পৃ ৩১), ধাঁধা (পৃ ৫৫), সচ্ছল (পৃ ১০৬)—বানানগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা দরকার। 'ঐ' না লিখে 'ওই' লেখাই ভাল—এই কে কী লিখি ! আপনাদের ছাপাখানায় যে হরফ আছে তাতে 'স্থ'-কে 'স্থ' করা যাবে—সেটাই স্বচ্ছ। অন্তঃবিসর্গ পরিহার করা ভাল—প্রসঙ্গত (পৃ ৪৯)। আদ্রেঁ নয় আঁদ্রে বার্জা (পৃ ৮৪)। ৩৭ পৃষ্ঠায় হয়েছে কিংবদন্তি, ১০৩-এ কিংবদন্তী - বানানের একরূপতা বিঘ্নিত হয়েছে।

শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
রহড়া